একাত্তরের চিঠি

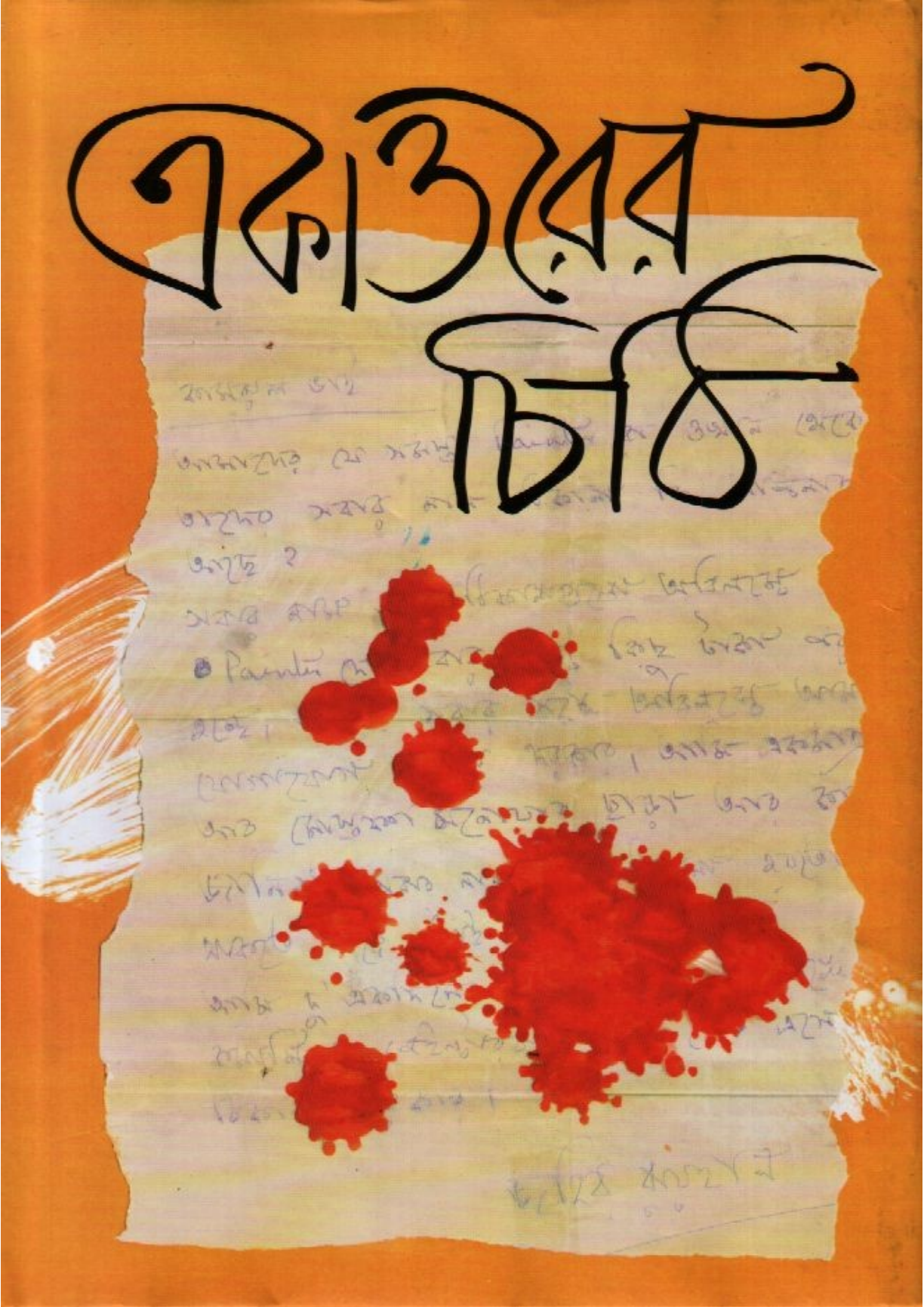

কৃতজ্ঞতা

একাত্তরের চিঠি বইটির প্রকাশক, প্রকল্প হোষ্টিং এর জন্য সামহোয়ারইন ব্লগ কর্তৃপক্ষ, প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্লগারদের- যাদের ছাড়া এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না।

২৯ শে মার্চ/রাজশাহী'৭১

আম্মা,
সালাম নেবেন।
আমি ভালো আছি এবং নিরাপদেই আছি। দুশ্চিন্তা করবেন না। আব্বাকেও বলবেন। দুশ্চিন্তা মনঃকষ্টের কারণ ছাড়া আর কোন কাজে আসে না। এখানে গতকাল ও পরশু Police বনাম Army-র মধ্যে সাংঘাতিক সংঘর্ষ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমরা জিততে পারিনি।

রাজশাহী শহর ছেড়ে লোকজন সব পালাচ্ছে। শহর একদম খালি। Military কামান ব্যাবহার করছে। ২৫০ মত Police মারা গিয়েছে। ৪ জন আর্মি মারা গিয়েছে। মাত্র। রাজশাহীর পরিস্থিতি এখন Army-আয়ত্তাধীনে রয়েছে। হাদী দুলাভাই ভালো আছেন। চিন্তার কারন নেই। দুলি আপার খবর বোধহয় ভালোই। অন্য কোথায় যেন আছেন। আমি যাইনি সেখানে।
পুষ্প আপা সমানে কাঁদাকাটি করে চলেছেন। ধাকার ভাবনায়। ক'দিন আগে গিয়েছিলাম। ধামকুড়িতে বোধহয় উনার মা আছেন। সম্ভব হলে খবর পৌঁছে দেবেন। আমার জন্য ব্যাস্ত হবেন না। যেভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, সেখানে আমাদের বেচেঁ থাকাটাই লজ্জার। আপনাদের দোয়ার জোরে হয়তো মরব না। কিন্তু মরলে গৌরবের মৃত্যুই হতো। ঘরে শুয়ে শুয়ে মড়ার মানে হয় কি?
এবার জিতলে যেমন করে হোক একবার নঁওগা যেতাম। কিন্তু জিততেই পারলাম না। হেরে বাড়ি যাওয়া তো পালিয়ে যাওয়া। পালাতে বড্ড অপমান বোধহয়। হয়ত তবু পালাতেই হবে। আব্বাকে ছালাম। দুলুরা যেন অকারণ কোনোরকম risk না নেয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বললাম কথাটা। তাতে শুধু শক্তি ক্ষয়ই হবে।
দোয়া করবেন
ইতি
বাবুল, ২৯/৩

চিঠি লেখকঃ শহীদ কাজী নুরুন্নবী। ১৯৭১ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র এবং কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর রাজশাহী বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১ অক্টোবর ১৯৭১ নুরুন্নবীকে পাকিস্তানি বাহিনী আটক করে শহীদ জোহা হলে নিয়ে যায়। তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের একটি হোস্টেল তাঁর নামে রয়েছে।

চিঠি প্রাপকঃ মা নুরুস সাবাহ রোকেয়া। শহীদের বাবার নাম, কাজী সাখাওয়াত হোসেন। ঠিকানাঃ লতা বিতান কাজীপাড়া, নওঁগাঁ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ ডা. কিউ এস ইসলাম, ১৮ শান্তিনগর, ঢাকা।

৫ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল

মাগো,
তুমি যখন এ পত্র পাবে, আমি তখন তোমার থেকে অনেক দুরে থাকব। মা, জানি, তুমি আমাকে যেতে দিবে না, তাই তোমাকে না বলে
চলে যাচ্ছি । তবে যেদিন মা-বোনের ইজ্জতের প্রতিশোধ এবং এই সোনার বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে পারব, সেদিন তোমার ছেলে তোমার কোলে
ফিরে আসবে।
দোয়া করবে, মা, তোমার আশা যেন পূর্ণ হয়।

ইতি
তোমারই
হতভাগা ছেলে

পুনশ্চ: সেই গাঢ় অন্ধকারে একাকী পথ চলেছি। শরীরের রক্ত মাঝে মাঝে টগবগিয়ে উঠছে, আবার মনে ভয় জেগে উঠছে, যদি পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ি, তবে সব আশাই শেষ(..) যশোর হয়ে নাগদা বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি। পথে একবার রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ি। তারা শুধু টাকা-পয়সা ও চার-পাচটা হিন্দু যুবতী মেয়েকে নিয়ে আমাদের ছেড়ে দেয়। তখন একবার মনে হয়েছিল, নিজের জীবন দিয়ে মেয়েদের ওদের হাত থেকে রক্ষা করি । কিন্তু পরমূহূর্তে মনে হয়, না, এদের উদ্ধার করতে গেলে প্রাণটাই যাবে, তাহলে হাজার মা বোনের কী হবে?
রাত চারটার দিকে বর্ডার পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করি। বাল্যবন্ধু শ্রী মদনকুমার ব্যানার্জি ইতনা কলোনি, শিবমন্দির, বারাসাত, ২৪ পরগনা - এই ঠিকানায় উঠলাম । এখানে এক সপ্তাহ থেকে ওই বন্ধুর বড় ভাই শরত্ চন্দ্র ব্যানার্জি আমাকে বসিরহাট মহকুমা ৮ নম্বর সেক্টর মেজর ডালিমের তত্ত্বাবধানে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিংয়ে ভর্তি করে দেন। সেখানে পরিচয় হয় ব.রেজিমেন্টের আবুল ভাইয়ের সঙ্গে। ট্রেনিং ক্যাম্পে এক সপ্তাহ থাকার পর কর্ণেল ওসমান গণির নির্দেশে আমাদের উচ্চ ট্রেনিং (...)

চিঠি লেখকঃ মুক্তিযেদ্ধা এ বি এম মাহবুবুর রহমান। তিনি চিঠিটি লিখেছিলেন ৮ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার, ট্রেনিং সেকশন, বসিরহাট সাব ডিভিশন, ২৪ পরকনা ভারত থেকে।
তাঁর বর্তমান ঠিকানাঃ বারি ৭ (দোতলা), সড়ক ১৮, ব্লক জি/১, সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা।
চিঠি প্রাপকঃ মা রাহেলা বেগম রাঙা, আখালিপাড়া, নদীয়ার চাঁদঘাট, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।
চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ লেখক নিজেই।

৫.৪.১৯৭১

মা,
আমার সালাম গ্রহন করবেন। পর সংবাদ আমি আপনাদের দোয়ায় এখনো পর্যন্ত ভাল আছি। কিন্তু কতদিন থাকতে পারব বলা যায় না। বাংলা মাকে বাঁচাতে যে ভূমিতে আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে ভাষায় কথা বলা শিখিয়েছেন, সেই ভাষাকে, সেই জন্মভুমি কে রক্ষা করতে হলে আমার মত অনেক জিন্নার প্রান দিতে হবে। দুঃখ করবেন না, মা। আপনার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যদি আপনার এই নগন্য ছেলের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়, সে রক্ত ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দেবে যে বাঙ্গালি এখনো মাতৃভূমি রক্ষা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে দ্বিধা বোধ করে না।

সময় নেই। হয়তো আবার কখন দৌড় দিতে হয় জানি না। তাই এই সামান্য পত্রটা দিলাম। শুধু দোয়া করবেন। সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। মা, যদি সত্যি আমরা এই পবিত্র জন্মভুমি থেকে ইংরেজ বেনিয়াদের মতো পাঞ্জাবি গুণ্ডাদের তাড়িয়ে দিয়ে এ দেশকে মুক্ত করতে পারি, তবে হয়তো আবার আপনার সাথে দেখা হতে পারে। বিদায় নিচ্ছি মা। ক্ষুদিরামের মতো বিদায় দাও। যাবার বেলায় ছালাম।
মা...মা...মা...যাচ্ছি।
ইতি
জিন্না

চিঠি লেখকঃ নৌ কমান্ডো শহীদ জিন্নাত আলী খান। পিতা শামসুল হক খান, গ্রামঃ ননীক্ষির, ডাকঃ ননীক্ষির, উপজেলাঃ মকসুদপুর, জেলাঃ গোপালগঞ্জ

চিঠি প্রাপকঃ মা শুকুরুননেছা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ ইয়াসির আরাফাত খান

তারিখঃ ১৬/০৪/৭১

প্রিয় ফজিলা,

জানি না কী অবস্থায় আছ। আমরা তো মরণের সাথে যুদ্ধ করে এ পর্যন্ত জীবন হাতে নিয়ে বেঁচে আছি। এর পরে থাকতে পারব কি না বুঝতে পারছি না। সেলিমদের বিদায় দিয়ে আজ পর্যন্ত অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। আবার মনে হয় তারা যদি আর একটা দিন আমাদের এইখানে থাকত তাহলে তাদের নিয়ে আমি কী করতাম। সত্যিই ফজিলা, রবিবার ১১ এপ্রিলের কথা মনে হলে আজও ভয় হয়। রাইফেল, কামান, মেশিনগান, বোমা, রকেট বোমার কী আওয়াজ আর ঘর বাড়ির আগুনের আলো দেখলে ভয় হয়। সুফিয়ার বাড়ির ওখানে ৪২ জন মরেছে। সুফিয়ার আব্বার হাতে গুলি লেগেছিল। অবশ্য তিনি বেঁচে আছেন। সুফিয়াদের বাড়ি এবং বাড়ির সব জিনিস পুড়ে গেছে। য়ামাদের বাড়িতে তিন-চার দিন শোয়ার মত জায়গা পাইনি। রাহেলাদের বাড়ির সবাই, ওদের গ্রামের আর ১৫-১৬ জন, সুফিয়ার বাড়ির পাশের বাড়ির চারজন, দুলালের বাড়ির সকলে, দুলালের ফুফুজামাই দীঘির কয়েকজন এসে বাড়িতে উঠল। তাই বলি, সেই দিন যদি আব্বা এবং সেলিমরা থাকত তাহলে কী অবস্থা হতো। এদিকে আমরাও আবার পায়খানার কাছে জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম। কী যে ব্যাপার, থাকলে বুঝতে। বর্তমানে যে পরিস্থিতি তা আর বলার নয়, রাস্তার ধারের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই। রোজ গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ছাড়াও যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দুই একদিন পর আধা মরা আবস্থায় রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক এসব ঘটনা। বাড়িতে আগুন আর গুলি করে মানুষ মারার তো কথাই নেই। তা ছাড়া লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি সব সময় হচ্ছে। কয়েকদিন বৃষ্টির জন্য রাস্তা ঘাটে কাদা হওয়ায় আমরা বেঁচে আছি। রাস্তাঘাট শুকনা থাকলে হয়তো আমাদের এদিকেও আসত। জানি না ভবিষ্যতে কী হবে। তবে ওরা শিক্ষিত এবং হিন্দুদের আর রাখবে না বলে বিশ্বাস। হিন্দু এবং ছাত্রদের সামনে পেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করছে। গত রাতে পাশের গ্রামে এক বাড়িতে ডাকাত্রা এসে সেই বাড়ির মানুষদের যা মেরেছে তা আর বলার নয়। কখন কী হয় বলার নেই। তবু খোদা ভরসা করে বেঁচে আছি। আমাদের এদিকে ছেলেরা প্রায় সবাঈ বাড়ি ছেড়ে দূরে থাকে। কারণ বাড়িতে থাকা এ সময় মোটেই নিরাপদ নয়। তোমাদের দেখার জন্য চৌবাড়ি যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছি। দুঃখের বিষয়, একটি দিনও বৃষ্টি থামেনি। অবশ্য বৃষ্টি না থামার জন্য আমাদের একটু সুবিধাই হয়েছে। তোমাদের সংবাদ জানানোর মতো কনো পথ নেই। কীভাবে যে সংবাদ পাব ভেবে পাই না। মিঠু বোধ হয় এখন হাঁটতে শিখেছে তাই না? মিঠুকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু পথ নেই। সান্ত্বনা এইটুকুই যে বেঁচে থাকলে একদিন দেখা হবে। কিন্তু বাঁচাই সমস্যা। রাতে ঘুম নেই দিনে পালিয়ে বেড়াই। মা-বাবা তো

প্রায়ই আমার জন্য কাঁদে। যাক, দোয়া করো যেন ভালো থাকতে পারি। বুবুদের যে কী অবস্থায় পাঠিয়েছি, তা মনে হলে দুঃখ লাগে। আমি সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্ভব হয়নি। অবশ্য সেদিন নাপাঠালে তাদের নিয়ে দারুন মুশকিলে পড়তে হতো। রবিবার দিন বাবলুর আম্মা মেরীগাছা এসেছিল। বাবলুরা ভালো আছে। তোমাদের সংবাদটা জানাতে পারলে জানাবে। আমার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভীষন খারাপ। বুবু, আম্মা, দুলাভাইকে আমার সালাম এবং সেলিমদের ও মিনাদের আমার স্নেহ দেবে। সম্ভব হলে তোমাদের সংবাদটা জানাবে। আমরা তো মরেও কোনো রকমে বেঁচে আছি। শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না।

ইতি

আজিজ

চিঠি লেখকঃ শহীদ মুক্তিযদ্ধা আব্দুল আজিজ।

চিঠি প্রাপকঃ স্ত্রী ফজিলা আজিজ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ মোঃ ফারুক জাহাঙ্গীর, গ্রামঃ কুজাইল, নাটোর। ফারুক জাহাঙ্গীর শহীদ মুক্তিযুদ্ধা আব্দুল আজিজের পুত্র

১৮/৪/৭১

মা,

আপনি এবং বাসায় সবাইকে সালাম জানিয়ে বলছি, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না। তাই ঢাকার আরও ২০টা যুবকের সাথে আমিও পথ ধরেছি ওপার বাংলায়। মা, তুমি কেঁদো না, দেশের জন্য এটা খুব ন্যূনতম চেষ্টা। মা, তুমি এ দেশ স্বাধীনের জন্য দোয়া করো। চিন্তা করো না, আমি ইনশাল্লাহ বেঁচে আসব। আমি ৭ দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারি কি বেশিও লাগতে পারে। তোমার চরণ মা, করিব স্মরণ। আগামীতে সবার কুশল কামনা করে খোদা হাফেজ জানাচ্ছি।

তোমারই বাকী (সাজু)

চিঠির লেখকঃ শহীদ আবদুল্লাহ হিল বাকী (সাজু), বীর প্রতীক। পিতা : এম এ বারী

চিঠি প্রাপকঃ মা আমেনা বারী, ২০৩/সি বাকী ভবন, খিলগাঁও, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ মনজুর-উর রহমান ও নাজ রাসকিন।

২৩/৪/৭১

মা,

দোয়া করো। তোমার ছেলে আজ তোমার সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে চলেছে। বর্বর পাকিস্তিনি জঙ্গিপোষ্ঠী আজ তোমার সন্তানদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে তোমার সন্তানদের ইজ্জতের ওপর আঘাত করেছে, সেখানে তো আর তোমার সন্তানরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই আজ তোমার হাজার হাজার বীর সন্তান বাঁচার দাবি নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'তোমার নগণ্য ছেলে তাদের মধ্যে একজন।' পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দু হাত তুলে দোয়া করি তোমার সন্তানরা যেন বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠীকে কতল করে এ দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। ' এ দেশের নাম হবে বাংলাদেশ' সোনার বাংলাদেশ। এ দেশের তোমার কত বীর সন্তান শহীদ হয়ে গিয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। ইনশাল্লাহ্ শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। দোয়া করো যেন জয়ের গৌরব নিয়ে ফিরে আসতে পারি, নচেৎ-বিদায়।

ইতি
তোমার হতভাগ্য ছেলে খোরশেদ

চিঠি লেখকঃ মো. খোরশেদ আলম। মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর ২,
বর্তমান ঠিকানাঃ ১-ই৭/৪ মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।

চিঠি প্রাপক : মা রাহেলা খাতুন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ লেখক নিজেই।

৬.৫.৭১

প্রিয় মোয়াজ্জেম সাহেব,
তসলিম। আশা করি খোদার রহমতে কুশলে আছেন। কোন মতো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে (মুরগী যেমন তার ছানাগুলো ডানার তলে রাখে) বেঁচে আছি । পত্রবাহক আপনার পূর্বে দেওয়া আশ্বাস অনুযায়ী আপনার কাছেই যাচ্ছে । শ্বাপদশংকুল ভরা এ দুনিয়ার পথ। নিজের হেফাজতে যদি রাখতে পারেন তবে খুবই ভালো - নতুবা নিরাপদ স্হানে (চিতলমারীর অভ্যন্তরে কোন গ্রামে) পৌছানোর দায়িত্ব আপনার । বিশেষ কিছু দরকার মনে করি না। মানুষ মানুষ কে হত্যা করে আর মানুষের সেবা মানুষেই করে। হায়রে মানুষ! আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন জানি - তা সত্ত্বেও অনুরোধ থাকল।

ইতি আপনাদের
আ. হা. চৌধুরী

চিঠি লেখক: আবদুল হাসিব চৌধুরী ১৯৭১ সালে তার ঠিকানা আমিনা প্রেস, কোর্ট মসজিদ রোড, বাগের হাট।

চিঠি প্রাপক: মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মো: মোয়াজ্জেম হোসেন। বাগেরহাটের পি সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর তিনি শত্রুপক্ষের গুলিতে নিহত হন। অর্থনীতি বিষয়ে তার কিছু বই বিভিন্ন কলেজে পাঠ্য রয়েছে।
চিঠিটি পাঠিয়েছে: মোয়াজ্জেম হোসেন ফাউন্ডেশন, বাগেরহাট।

তাং: ২৩-০৫-১৯৭১

জনাব আব্বাজান,
আজ আমি চলে যাচ্ছি। জানি না কোথায় যাচ্ছি। শুধু এইটুকু জানি, বাংলাদেশের একজন তেজোদৃপ্ত বীর স্বাধীনতাকামী সন্তান হিসেবে যেখানে যাওয়া দরকের আমি সেখানেই যাচ্ছি। বাংলার বুকে বর্গী নেমেছে। বাংলার নিরীহ জনতার উপর নরপিশাচ রক্তপিপাসু পাক-সৈন্যরা যে অকথ্য বর্বর অত্যাচার আর পৈশাচিক হত্যালীলা চালাচ্ছে, তা জানা সত্ত্বেয় আমি বিগত এক মাস পচিঁশ দিন যাবৎ ঘরের মধ্যে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থেকে যে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছি, আজ সেই অপরাধের পায়শ্চিত্ত করার জন্য যাত্রা শুরু করলাম। সমগ্র বাঙ্গালী যেন আমাকে ক্ষমা করতে পারেন। আপনি হয়ত দুঃখ পাবেন। দুঃখ পাওয়ারই কথা। যে সন্তানকে দীর্ঘ ষোল বছর ধরে তিল তিল করে হাতে কলমে মানুষ করেছেন, যে ছেলে আপনার বুকে বারবার শনি কৃপাণের আঘাত হেনেছে, যে ছেলে আপনাকে এতটুকু শান্তি দিতে পারেনি, অথচ আপনি আপনার সেই অবাধ্য দামাল ছেলেকে বরংবার ক্ষমাসুন্দুর দৃষ্টিতে দেখেছেন, যার সমস্ত অপরাধ আপনি সীমাহীন মহানুভবতার সঙ্গে ক্ষমা করেছেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন সম্ভবত একটি মাত্র্য কারণে যে, আপনার বুকে পুত্রবাৎসল্যের রয়েছে প্রবল আকর্ষণ।

আজ যদি আপনার সেই জেষ্ঠ্য ফারুক স্বেচ্ছায় যুদ্ধের ময়দানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যকে আলিঙ্গন করে, তাহলে আপনি কি দুঃখ পাবেন, বাবা? আপনার দুঃখিত হওয়া সাজে না, কারণ হানাদেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যদি নিহত হই, আপনি হবেন শহীদের পিতা। আর যদি গাজী হিসেবে আপনাদের স্নেহছায়াতলে আবার ফিরে আসতে পারি, তাহলে আপনি হবেন গাজীর পিতা। গাজী হলে আপনার গর্বের ধন হব আমি। শহীদ হলেও আপনার অগৌরবের কিছু হবে না। আপনি হবেন বীর শহীদের বীর জনক। কোনটার চেয়ে কোনটা কম নয়। ছেলে হিসেবে আমার আবদার রয়েছে আপনার উপর। আজ সেই আবদার রয়েছে আপনার উপর। আজ সেই আবদারের উপর ভিত্তি করে আমি জানিয়ে যাচ্ছি বাবা, আমি তো প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। আমার মনে কত আশা, কত স্বপ্ন। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে কলেজে যাব। আবার কলেজ দিঙিইয়ে যাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে। মানুষের মতো মানুষ হব আমি।

আশা শুধু আমি করিনি, আশা আপনিও করেছিলেন। স্বপ্ন আপনিও দেখেছেন। কিন্তু সব আশা, সব স্বপ্ন আজ এক ফুৎকারে নিভে গেল। বলতে পারেন এর জন্য দায়ী কে? দায়ী যারা সেই নরঘাতকের কথা আপনিও জানেন। বাংলাদেশের প্রটিটি মানুষ ওদের কথা জানে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে--Mother and Motherland are superior to heaven. স্বর্গের চেয়েও উত্তম মা এবং মাতৃভূমি। আমি তো যাচ্ছি আমার স্বর্গাদপী গরীয়সী সেই মাতৃভূমিকে শুক্রর কবল থেকে উদ্ধার করতে। আমি যাচ্ছি শত্রুকে নির্মূল করে

আমাদের দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে, বাবা, শেষবারের মতো আপনাকে একটা অনুরোধ করব। সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নিকট সবসময় দোয়া করবেন, আমি যেন গাজী হয়ে ফিরতে পারি। আপনি যদি বদদোয়া বা অভিশাপ দেন, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

জীবনে বহু অপধ করেছি। কিন্তু আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন। এবারও আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, এই আশাই আমি করি। আপনি আমার শতকোটি সালাম নেবেন। আম্মাজাঙ্কে আমার কদমঅবুসি দেবেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলবেন। ফুফু আম্মাকেও দোয়া করতে বলবেন। ফয়সাল, আফতাব, আরজু, এ্যানি ছটদের আমার স্নেহাশিস দেবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন আর সবসময় হুঁশিয়ার থাকবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের ফারুক

চিঠি লেখকঃ ফারুক। শহীদ মুক্তিযুদ্ধা আমানউল্লাহ চৌধুরী ফারুক। চট্টগ্রাম সিটি কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। নোয়াখালীর কম্পানীগঞ্জ থানার বামনী বাজারের দক্ষিণে বেড়িবাঁধের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। এই যুদ্ধে আরও চার মুক্তি যোদ্ধা শহীদ হন।

চিঠি প্রাপকঃ বাবা হাসিমউল্লাহ চৌধুরী। চিঠিটি মৃত্যুর কদিন আগে লেখা। ঠিকানাঃ অম্বরনগর মিয়াবাড়ি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ মেজর (অব.) কামরুল ইসলাম ভুঁইয়া।

২৮.৫.১৯৭১

স্নেহের মা জানু,

আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা নিয়ো। তোমার শাশুড়ি আম্মাকে আমার সালাম দিয়ো। দুলা মিয়া, পুত্রা মিয়ারা, ঝিয়ারীগণ ও সোহরাব, শিমুলকে আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসা জানাইয়ো। এখানে খাওয়াদাওয়ার যেমন অসুবিধা, তেমন লোকের ঝামেলাও অনেক বেশি। সেদিন তোমাদের বাড়ি হইতে আসিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। দেড় ঘন্টার মধ্যে বিলোনিয়া পৌঁছিয়াছি। তোমাদের বাড়ি জইতে যেদিন ফিরিয়াছি সে রাতে মোটেই ঘুম হয় নাই। দুলা মিয়া, তুমি এবং আমার স্নেহের নাতিদের কথা মনে পড়ার সাথে সাথে ২৩/০৪/৭১ ইং তারিখে (...) তোমার মাতা, রেখা, রেণু, রুবি, রৌশন ও তার চারটি ছেলে। আমার বৃদ্ধা ও রুগণ আব্বা ও জীবনের যৎসামান্য আড়াই লক্ষ টাকার নগদ টাকা ও সম্পদ সবকিছুর কথা। দোকান, বাসা ও মালপত্র ছাড়াও সরকারের ঘরে ৮০ হাজার টাকার মত পাওনা রহিয়াছে। তা পাওয়া যাইবে কি না যাইবে তাহার কথা বেশি ভাবি কি না। বাংলাদেশে যখন ফিরিতে পারি এবং যদি কখনো ফিরি তবে ফেলিয়া আসা ছাইয়ের উপর দাঁড়াইয়া আবার নতুনভাবে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিবার আশা নিয়া বাঁচিয়া আছি। জানু, কয়েকটা কথা প্রায় দিন বারবার মনে পড়ে। এই কথাগুলো ভুলিতে পারিব দেশে ফিরিবার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া. দেশে ফিরিয়া গিয়া, নতুবা মৃত্যুর পর। ২২/৪/৭১ ইং তারিখ দিবাগত রাত্র দেড়টার সময় দেশের বাড়ি হইতে বাহির হওয়ার সময় সকলের থেকে বিদায় নেওয়ার পর যখন আব্বার থেকে বিদায় নিতে যাই তখন আব্বা আমাকে কোনো অবস্থায় যাইতে দিবেন না বলিয়া হাত চাপিয়া ধরেন এবং জোরে কাঁদা আরম্ভ করিয়া দেন। বাড়িতে বা দেশে থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া রৌশন এবং অন্যরা জোর করিয়া আব্বার হাদ হইতে আমাকে ছিনাইয়া লয় এবং আল্লাহর হাতে সঁপিয়া দিয়া রাত্র ২ ঘটিকার সময় সকলের বাঁদার রোল ভেদ করিয়া তোমার আম্মার সাথে দেখা করিবার জন্য কায়ুমবে সাথে লইয়া কচুয়ার পথে রওনা হই। কচুয়া একদিন থাকিয়া তোমার আম্মা, রেখা, রেণু ও রুবিকে কাঁদা অবস্থায় ফেলিয়া রাত্র ৪টার সময় রওনা হইয়া তোমার নিকট আসিয়া পৌঁছাই।

বাড়ি হইতে রওনা হওয়ার পূর্বেই কথা হইয়াছিল যে রৌশন পরের দিন সকালে চর চান্দিয়া রওয়ানা হইয়া যাইবে। এই ঋতুতে যে কোনো দিন সে এলাকায় থাকার অন্য বিপদ ছাড়াও ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ যেকোনো মুহুর্তেই হইতে পারে। কোনো গত্যন্তর না থাকায় আমার প্রাণের 'মা' রৌশন ও সোনার বরন চারজন নাতিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মুখে ঠেলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। তুমিও জানো যে তোমার মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তাহাদিগকে উক্ত কারণে বাসায় রাখিতে চাহিতাম।

তোমাদের সকলের মুখ উজ্বল করিবার জন্য নিজের চেষ্টায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহা আজ অবস্থার গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে সব ধুলিসাৎ হইয়া গেল। সবকিছু ভুলিবার চেষ্টা করিয়াও ভোলা যায় না। 'মা' তুমি অনুভব করিতে পার কি না জানি না, তবে আমার ছেলেদের অপেক্ষায় তেমাদেরকে অন্তরে অধিক ভালোবাসি। সে ক্ষেত্রে আজ আমার পাঁচ মেয়ে ভিনদেশে রাখিয়া আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিনা। জানু, আজকে তুমি আমার

একমাত্র নিকটে, তাই তোমাকে দেখিবার চেষ্টা করি। দুলা মিয়া, তুমি ও সোহরাব, শিমুলকে সামনে দেখিতে পাইলে একটু আনন্দ পাই এবং কিছুটা মানের ভাব লাগব হয়। আত্মীয়স্বজন সকলের আগ্রহ দেখিয়া নিজেকে হালকা বোধ করি, চিন্তামুক্ত থাকি।
কায়ুম, মোতা, কবীর, আপসার ও আক্তার সব এখানে আছে। ক্যাম্পে জায়গা হয় নাই বলিয়া। এখানে ফেরত আসিয়াছে। আগামী ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আশা, কয়েক দিনের মধ্যে যাওয়া হইবে। সোহরাব ও শিমুলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়ো। আমি ভালো। তোমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি তোমাই
বাবা

চিঠি লেখকঃ মরহুম আবদুল মালেক, ফেনী জেলা চেম্বার অব কমার্স ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ফেনীর বিলোনিয়া ট্রানজিট ক্যাম্পের প্রথান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণের জন্য ফেনীর মাধুপুরের নিজ প্রাম থেকে রওনা হয়ে বিলোনিয়া ক্যাম্পে আসেন। ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর এই চিঠিটি লেখেন।

চিঠি প্রাপকঃ মেয়ে জানু।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ ফারহাদ উদ্দীন আহাম্মদ। চিঠি লেখকের নাতি এবং জানুর দ্বিতীয় পুত্র।

Agartala, June 16, '71

Dearest Pasha Mama,
Don't be surprised! It was written and has come to pass. And after you read this letter, destroy it. It will put them in danger.

This is a hurried letter. I don't have much time. I have to leave tomorrow for my base camp.

We are fighting a just war. We shell win . Pray for us all. I don't know what to write...there is so much write about. But every tale of atrocity you hear, every picture of terrible destruction that you see is true. They have torn into with us with savagery unparalleled in human history. And sure as Newton was right, so shall we too tear into them with like ferocity. Already our war is far advanced. When the monsoons come we shell intensify our operation.

I don't know when I shall write again. Please don't write to me. And do your best for SONAR BANGLA.

Bye for now. With love and regards.
Rumi

চিঠি লেখকঃ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমী। পুরো নাম সাফি ইমাম রুমী। বাবা শরিফুল আলম ইমাম আহমেদ, মা জাহানারা ইমাম।

চিঠি প্রাপকঃ তাহমিদ সাঈদ লালু। শহীদ রুমীর মামা।

বর্তমান ঠিকানাঃ বাড়ি ৭, ফ্ল্যাট এ৫, সড়ক ৬, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সংগ্রহঃ শহীদজননী জাহানারা ইমাম পাঠাগার থেকে।

আগরতলা
১৬ জুন, '৭১

প্রিয় পাশা মামা,
অবাক হয়ো না! এটা লেখা হয়েছে আর তোমার কাছে পৌছেছে। আর পড়ার পর চিঠিটা নষ্ট করে ফেলো। এ নিয়ে আম্মাকেও কিছু লিখোনা। তাহলে তাদের বিপদে পড়তে হবে। তারাহুড়া করে লিখলাম। আমার হাতে সময় খুব কম। বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে কাল এখান থেকে চলে যেতে হবে।

আমরা একটা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ লড়ছি। আমরা জয়ী হব। আমাদের সবার জন্য দোয়া কোরো। কী লিখব বুঝতে পাড়ছি না--কত কী নিয়ে যে লেখার আছে! নৃশংসতার যত কাহিনী তুমি শুনছ, ভয়াবহ ধ্বংসের যত ছবি তুমি দেখছ, জানবে তার সবই সত্য। ওরা আমাদের নৃশংসতার সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করেছে, মানব ইতিহাসে যার তুলনা নেই। আর নিউটন আসলেই যথার্থ বলেছেন, একইধরনের হিংস্রতা নিয়ে আমরাও তাদের উপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেব।

জানি না আবার কখন লিখতে পারব। আমাকে লিখ না। সোনার বাংলার জন্য যা পারো কর।

এখনকার মত বিদায়।
ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাসহ
রুমী

*পূর্ববর্তী চিঠির অনুবাদ।

মহাদেও
১৬.৬.৭১ইং

হেনা,

আশা করি ভালো আছ। তোমাদিগকে খবর দেওয়া ছাড়া তোমাদের কোন খবর পাওয়ার কোন উপায় নেই, আর আশা করেও লাভ নেই। অনেকের নিকট বলেদেই মহিশখালীর C/O Sekandar Nuri চিঠি পাঠালে সে আমার নিকট পাঠাতে পারে। আল্লাহর নিকট সুধু প্রার্থনা এই যে, তোমরা সবাই যেন ভালো থাক। আমি অদ্য মহেশখলা থেকে তুরার পথে রওনা হয়েছি। অদ্য আমি মেঘালয় প্রদেশের মহাদেও ক্যাম্পে আছি। আমার সংঙ্গে খালেক সাহেব M.P.A ও জাবেদ সাহেব M.N.A আছেন। আগামীকল্য রংড়া ক্যাম্পে গিয়া থাকবার আশা রাখি। সমস্ত পথই হেঁটে চলছি। মহেশখরা হতে রংড়া ৩৫ মাইল। রংড়া হতে গাড়ি পাওয়ার রাস্তা হবে তুরা। যা হোক আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। নানান দেশর উপর দিয়ে চলেছি। ছোট বেলা পড়তাম, ময়মনসিংহের উত্তরে গারো পাহাড় আর এখন গারো পাহাড়ের সর্বোচ্চ টিলার উপর ১০ দিন ঘুমিয়ে এলাম আর পাহাড়ের ভিতর দিয়েই রওনা হলাম। দেশ ভ্রমনে আনন্দ আছে কিন্তু যখন তোমাদের কথা মনে হয় তখন মন ভেঙে যায়। বিশেষ করে সোহেলের কথা ভুলতেই পারি না। সোহেলটাই আমাকে বেশি বিব্রত করেছে। ওর দিকে বিশেষ লক্ষ রেখো। তোমাদের আর কী লিখব। তোমরা বাড়ি থেকে সরে গেছ কি না জানি না। তোমাদের উপর আক্রমণ আসতে পারে; তাই পূর্ব পত্রে লিখেছিলাম বাড়ি থেকে সরে যেতে। কোথায় আছ তা যেন অন্য লোক না জানে। যেখানেই যাো রাস্তায় যেন কোন অসুবিধা না হয় তার প্রতি বিশেষ নজর রেখে চলো। সোহেল বোধহয় আমাকে খোঁজে। আস্তে আস্তে হয়তো আমাকে ভুলেই যাবে। যা হোক নামাজ নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করি। তার জন্য কোনো চিন্তা করো না। পূর্বে আরও দুটি চিঠি দিয়েছি ধান ও গাড়িটার কথাো বলেছিরাম সরিয়ে রাখতে। আজকে স্বাধিন বাংলা বেতারের খবরে নিশ্চই শুনেছ যে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের বাড়িও আক্রমন করতে ছাড়েনি। সতরাং খুব সাবধান। বিশেষ আরকি লিখব। ইচ্ছা আছে তুরা হতে ফিরে আসব আবার মহেশখালী।

দোয়া করিয়ো।
আখলাক।

চিঠি প্রেরক: অখলাকুল হোসেইন আহমেদ। ১৯৭০ সালে তিনি এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। চিঠিটি তিনি ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা জেলার মহাদেও থেকে লিখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রথমে তুরার মহিশখালির ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন। পরে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হন। তাঁর বর্তমান ঠিকানা: ছায়ানীড়, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।

চিঠি প্রাপক: হেনা, লেখকের স্ত্রি। তাঁর পুত্রের নাম হোসনেআরা হোসেন।

চিঠি পাঠিয়েছেন: সাইফ-উল হাসান, অ্যাপার্টমেন্ট ১ সি, বিল্ডিং ২ এ, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, আদাবর ঢাকা।

২৭.৬.১৯৭১ ইং

মা,

আমার শত সহস্র সালাম ও কদমবুসি গ্রহন করিবেন। আমার কাছেও তদ্রুপ রহিল। এত দিনে নিশ্চয় আপনারা আমার জন্য খুবই চিন্তিত। আমি আল্লাহর রহমতে ও আপনাদের দোয়ায় বাংলাদেশের যেকোন একস্থানে আছি। আমি এই মাসের ২০ হইতে ২৫ তারিখের মধ্যেই বাংলাদেশে আসিয়াছি। যাক, বাংলাদেশে আসিয়া আপনাদের সাথে দেখা করিতে পারিলাম না। আমাদের নানাবাড়ীর (...) বাড়ীর খবরাখবর নিম্নের ঠিকানায় লিখিবেন। আমি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আসিয়াছি (আশা করি বাংলায় স্বাধীনতা আসিলেই আমি আপনাদের কলে ফিরিয়া আসিব।) আশাকরি, মেয়াভাই ও নাছির ভাই ইএবং আমাদের স্বজন বাংলার স্বাধীনতাসংগ্রামে লিপ্ত। যাক, বর্তমানে আমি ময়মনসিংহ আছি। এখান থেকে আজই অন্য জায়গায় চলিয়া যাইব। দোয়া করিবেন।

পরিশেষে

আপনার স্নেহ মুগ্ধ
ফারুক
জয় বাংলা

চিঠি লেখকঃ শহীদ ওমর ফারুক। ভোলা জেলার সদর উপজেলার চরকালী গ্রামের আনোয়ারা বেগম ও আব্দুল ওদুদ পণ্ডিতের পুত্র। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে গাইবান্ধার নান্দিনায় সংঘটিত যুদ্ধে তিনি শহীদ হন

চিঠি প্রাপকঃ মা আনোয়ারা বেঘম, গ্রামঃ চরকালী, সদর উপজেলা, জেলাঃ ভোলা

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ জহরুল কাইয়ুম, থানাপাড়া, গাইবান্ধা ও মাহমুদ আল ইসলাম, স্টারলিং ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ৬৬/১ নূর প্যালেস, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা ১২০৬

১৩ আষাঢ় ১৩৭৮
মহৎপুর
১.৭.১৯৭১

প্রিয় ফজিলা,
আমার অফুরন্ত ভালোবাসা নিয়ো। আমার এই চিঠির ওপর নির্ভর করছে তোমার আগামী দিনের (সুখ ও দুঃখ)। এই চিঠি পড়ে দুঃখ পাএয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ জন্ম ও মৃত্যু মানুষের হাতে নয়, এটা পরম করুণাময় আল্লাহর হাতে। তার নির্দেশ ব্যতীত দুনিয়ার কোনো হাক হতে পারে না। একটা পা তুললে সে (মানে করুণাময় আল্লাহ) যতক্ষণ পর্যন্ত পা ফেলার হুকুম না দেবে ততক্ষণ কারোর ক্ষমতা নেই পা ফেলে। তাই বলছি দুঃখ কারো না, যে পরিস্থিতি, কখন কার মৃত্যু হয় কেউ বলতে পারে না। আমি কখন কোথায় থাকব, আমি নিজে বলতে পারি না।তাই বলছি 'আল্লাহ যদি আমার মরণ লিখে থাকে, হয়তো কোথায় কীভাবে মরণ হবে কারুর সঙ্গে দেখা হবে , কিছু বলতেও পারব না। মানে দুঃখ থাকবে তাই আগে থেকেই লিখে যাচ্ছি। এটা পড়ে কেঁদো না। এই লিখছ বলে যে সত্যি সত্যি মরব তা তো নয়! যদি মরি তবে তো বলতে পাবর না সেই জন্য লিখলাম। যদি মরি আমার দেওয়ার মতো কিছু নেই। আছে একটু ভালোবাসা আর একটু আশীর্বাদ আর ক-বিঘা জমি। আগেও বলেছি এখনো বলছি, ইচ্ছা যা-ই হোক, কারোর যুক্তি শুনে এক কাঠা জমি বিক্রি কোরো না। যদি কেউ বলে, ওখান থেকে বেচে এখানে ভালো জমি কিনে দেব, খুব সাবধান, তা করেছ কি মরেছ। আমি যদি মরি আমি দেখতে আসব না , সুখে আছ না দুঃখে আছ। তাই আমার আদেশ নয়, অনুরোধ করছি বারবার। আমার কথাগুলো শুনো। কারোর কথা শুনে কোনো কাজ করো না. তাই যতই ভালো কাজ হোক না কেন, তাতে দুঃখ পাবে, তখন আমার কথা মনে হবে। বাচ্চাটা বুকে নিয়ে থেকো, সুখে থাকবে। কারোর কথা শুনে কোনো কাজ করলে জমি তোমার থাকবে না। তখন কেউ দেখতে পারবে না। যে মেয়ের স্বামী মরে যায় বা নেয় না, তার বাব-ভাই আত্মীয়স্বজন কেউ ভালো চোখে দেখে না। তাই যত আদুরে হোক না, এটা মেয়েদের অভিশাপ। বেশি বলতে হবে না, পাশে অনেক প্রমাণ আছে। জমিজামা ও জিনিসপত্র থাকলে সবাই যতন করবে, তোমার পারেয় জুতা খুলে গতি হবে না। তাই বারবার অনুরোধ করছি জিনিসপত্র যা এর-ওর বাড়ি আছে, ভাই জানে, ভাইয়ের সঙ্গে সব বলা আছে। বাপের বাড়ি হোক আর (...) হোক যেখানে হোক (..,) বেশি দিন থেকো, তোমার দোখো সবাই যত্ন করবে, তবে আমি যা বলেছি মনে রেখো। মেয়েটাকে মানুষ করো। লেখাপড়া মিখাও। মামণি যখন যা চায় তখন সেটা দেবার চেষ্টা করো। তুমি তো জানো যে একটা মেয়ে হওয়ার আমার কত আশা ছিল, আল্লাহ আমার আশা পূরণ করেছে। হয়তো নিজ হাতে সেভাবে মানুষ করতে পারব না, তবু আমার আশা আছে, তুমি যদি আমার কথা শোন তবে সেভাবে মানুষ করতে পারবে। আশা করে মামণির জন্য দোলনা করেছিলাম। দোলনায় বোধহয় মামণিল দোলা হলো না। বড় আশা করে হারমোনিয়াম কিনেছিলাম মানণিকে গান শেখাব, হারমনিটা নষ্ট করো না, তুমি শিখাও। তোমার কানেরটা-মামণিকে দেব বলে তোমার কানেরটা করলাম, মামণির সেটা

তো ডাকাতরা নিয়ে গেছে। আমার আশা আশাই থেকে গেল, আশা বোধহয় পূরণ হবে না। তাই আমার আশা তুমি পূরণ করো। আর কী লিখব, সত্যি যদি সরি আমার ঋণমুক্ত করো। তোমার কাছে যে ঋণ আছে হয়তো শোধ করতে পারব না। হয়তো সে (...) কষ্ট পাব বা আল্লাহতাআলার কাছে দায়ী থাকব, যদি পারো মন চায় শোধ করে দিয়ো। আর কিছু লিখলাম না।

ইতি তোমার স্বামী
গোলাম রহমান
মহৎপুর, খুলনা।

চিঠির লেখকঃ মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম রহমান। গ্রাম: মহৎপুর, পো; ওবায়দুর নগর। উপজেলা: কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

চিঠির প্রাপকঃ স্ত্রী ফজিলা। তালতলা মসজিদ, সিটি করেজ মোড়, খুলনা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ গোলাম রহমানের ছেলে আসালামুজ্জামান।

৭.৭.৭১

শ্রী হেমেন্দ্র দাস পুরকায়স্হ
শ্রদ্ধাস্পদেষু,
আপনাদের খবর অনেক দিন পাইনি। বাঁশতলা ক্যাম্প দেখাবর পর সেই ছেলেদের মুখগুলো সমানেই চোখের ওপর ভাসছে। তাদের মধ্যে যে সাহস, শৃঙ্খলা ও উদ্দীপনা দেখেছি তা আমার জীবনে এক নতুন ইঙ্গিত বয়ে এনেছে। কত লোকের কাছে যে সে কাহিনী বলেছি তা বলার নয়। তাদের কিছু জিনিস দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু শুনছি তারা শিগগিরই youth camp-এ চলে আসবে এবং সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করা হবে। তাই আমাকে সেগুলো জোগাড় করতে মানা করা হলো।

আমি ক্যাম্পের মেয়েদের জন্য কিছু শাড়ি সংগ্রহ করেছি । আপনি প্রয়োজনমত তা বিলি করার ব্যবস্হা করে দেবেন। কাকিমার জন্য একখানা লালপাড় শাড়ি পাঠালাম - তিনি যেন তা ব্যবহার করেন। বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু জামাকাপড় পাঠালাম - অল্প ওষুধ ও ফিনাইল পাঠালাম, আশা করি কাজে লাগবে। আমি সেলা ক্যাম্পে যাবার পর বালাট, ডাউকী, উমলারেম (আমলারেং) প্রভৃতি ক্যাম্পে ঘুরেছি।

অবস্হা দুর্দশার চরম সীমায়, খালি মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাই অন্ধকারের আশার আলো বয়ে আনে। ভগবান তাদের স্বাস্হ্য ও দীর্ঘজীবন দিন - এই প্রার্থনা জানাই।

আপনার শরীর কেমন আছে? কাকীমা কেমন আছেন? ক্যাম্পের ও মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা কেমন আছেন? আজ এখানেই শেষ করি
আপনারা আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।
ইতি
অঞ্জলি

সংগ্রহঃ স্মৃতি কথা' ৭১ থেকে

পথের ধারে বাড়ি
১৫ জুলাই, '৭১

মা,

পথ চলতে গিয়ে ক্ষণিকের বিশ্রামস্থল রাস্তার ধারের এ বাড়ি তোমায় চিঠি লিখতে সাহায্য করছে। বাড়ি থেকে আসার পর এই প্রথম তোমায় লিখার সুযোগ পেলাম। এর পূর্বে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কাগজ, কলম, মন ও সময় একীভূত করতে পারিনি। টিনের চালাঘরে বসে আছি। বাইরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার সর্বত্র। প্রকৃতির একটা চাপা আর্তনাদ শোন যাচ্ছে টিনের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দে শব্দে। মাগো, আজ মনে পড়ছে বিদায়বেলায় তোমার হাসিমুখ। সাদা ধবধবে শাড়িটায় বেশ মানিয়েছিল তোমায়। বর্ষার সকাল। আকাশে খন্ড খন্ড সাদা মেঘের ভেলা ভাসছিল। মেঘের ফাঁকে সেদিকার পূর্ব দিগন্তের সূর্যটা বেশ লাল মনে হয়েছিল। সেদিন কি মনে হয়েছিল জানো মা, অসংখ্য রক্তবীজের লাল উত্তপ্ত রক্তে ছেয়ে গেছে সূর্যটা। ওর এক একটা কিরণচ্ছটা পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে এক একটি বাঙালি। অগ্নিপথে বলীয়ান, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত। মাগো, তোমার কোলে জন্মে আমি গর্বিত। শহীদের রক্ত রাঙা পথে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেকে তুমি এগিয়ে দিয়েছ। ক্ষণিকের জন্যও তোমার বুক কাঁপেনি, স্নেহের বন্ধন দেশমাতৃকার ডাককে উপেক্ষা করতে পারোনি। বরং তুমিই আমাকে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রেরণা দিয়েছ। দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছ। মা, তুমি শুনে খুশি হবে তোমারই মতো অসংখ্য জননী তাঁদের স্নেহ ও ভালোবাসার সম্পদ পুত্র-সন্তান, স্বামী, আত্মীয়, ঘরবাড়ি সর্বস্ব হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়নি; বরং ইস্পাতকঠিন মনোবল নিয়ে আজ অগ্নিশপথে বলীয়ান। মাগো, বাংলার প্রতিটি জননী কি তাদের ছেলেকে দেশের তরে দান করতে পারে না? পারে না এ দেশের জন্য মা-বোনেরা ছেলে ও ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াতে? মা তুমিতো একদিন বলেছিলে, 'সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন এ দেশের মায়ের কোলের শিশুরা মা-বাবার কাছে বিস্কুট-চকলেট চাইবে না জেনো, চাইবে রিভলাবার পিস্তল।' সেদিনের আশায় পথ চেয়ে আছে দেশের ট্রতিটি সন্তান। যেদিন বাংলার স্বাধীনতা সূর্যে প্রতিফলিত হবে অধিকারবঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত বুভুক্ষ সাড়ে সাত কোঠি জাগ্রত বাঙালির আশা, আকাঙ্ক্ষা। যে মনোবল নিয়ে প্রথম তোমা থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তা আজ শতগুণে বেড়ে গেছে, মা। রক্তের প্রবাহে আহ খুনের নেশা টগবগিয়ে ফুটছে। এ শুধু আমার নয়, প্রতিটি বাঙালি পাঞ্জাবি হানাদার লাল কুত্তাদের দেখলে খুনের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। তাই তো বাংলার প্রতিটি আনাচ-কানাচে এক মহাশক্তি ও দুর্জয় শপথে বলীয়ান মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা অনেক রেড়ে গেছে। তোমাদের এ অবুঝ শিশুগুলিই আজ হানাদার বাহানীকে চরম আঘাত হানছে। পান করছে হানাদার পশুশক্তির রক্ত। ওনা মানুষ হত্যা করে। আমরা পশু (ওদের) হত্যা করছি। এই তো সেদিন বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় সদর দক্ষিণ মহকামার কোনো এক মুক্ত এলাকায় ভালুকাতে (থানা) প্রবেশ করতে গিয়ে হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের হাতে চরম মার খেয়েছে। মা, তোমার ছোট্র ছেলে বিপ্লবের হাতে লেগে আছে বেশ কয়টা পশুর রক্ত। এমনি করে বাংলার প্রতিটি আনাচে-কানাচে মার খাচ্ছে ওরা। মাত্র শুরি। যুদ্ধনীতি ওদের নেই, তাই বাংলার নিরীহ অস্থহীন কৃষক,

শ্রমিক,ছাত্র-শিক্ষক, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীর ওপর হত্যাকান্ডের মই চালাচ্ছে।এ হত্যাকান্ড ভিয়েতনামের একাধিক " মাইলাইয়ের " হত্যাকান্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে।
ওরা পশু। পশুত্বের কাহিনী শুনবে , মা ? তবে শোনো। শত্রুকবলিত কোনো এক এলাকায় আমরা এক ধর্ষিতা বোনকে দেখেছিলাম নিজের চোছে। ডেকেছিলাম বোনকে। সাড়া দেয়নি। সে মৃত। সম্পূর্ন বিবস্ত্র দেহে পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন শরীরের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে। বাংলার শিশু ছিল তার গর্ভে। কিন্তু তবু পাঞ্জাবি পশুর হায়না কামদৃষ্টি থেকে সে রেহাই পায়নি। সে মরেছে কিন্তু একটা পশুকেও হত্যা করেছে। র্গবিত, স্তব্ধ, মূঢ় ও কঠিন হয়েছিলাম। আজ অসংখ্য ভাই ও বোনের তাজা রক্তকে সামনে রেখে পথ চলছি আমরা। মাগো, বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর এমন অত্যাচারের কাহিনী শুনে ও দোখে কি কোনো জননী তার ছেলে প্রতিশোধের দীক্ষা না দিয়ে স্নেহের বন্ধনে নিজের কাছে আটকে রাখতে পারে? পারে না। প্রতিটি জননীই আজ তাঁর ছেলেকে দেবে মুক্তিবাহিনীতে, যাতে রক্তের প্রতিশোধ, নারী নির্যাতনের প্রতিশোধ শুধু রক্তেই নেওয়া যায়। মা, আমার ছোট ভাই তীতু ও বোন প্রীতিকে আমার আছে কাছে পাঠিয়ে দাও। পারবে না আমাদের তিন ভাই-বোনকে ছেড়ে একা থাকতে? মা.মাগো। দুটি পায়ে পড়ি, মা। তোমার ছেলে ও মেয়েকে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে ঘরে আটকে রেখো না। ছেড়ে দাও স্বাধীনতার উত্তপ্ত রক্তপথে। শহীদ হবে, অমর হবে, গাজী হয়ে তোমারই কোলে ফিরে আসবে, মা।
মাগো, জয়ী আমরা হবই। দোয়া রেখো।

ইতি
তোমারই বিপ্লব।

চিঠি লেখকঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লব। চিঠি লেখকের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। মুক্তিযুদ্ধকালে এই চিঠি ময়মনসিংহ ভালুকা থেকে প্রকাশিত জাগ্রত বাংলায় প্রকাশিত হয়।

চিঠি প্রাপকঃ মা । তাঁর পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ ডা. মো. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষুবিজ্ঞান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৬.৭.১৯৭১

মা,

মুক্তিসেনাদের ক্যাম্প থেকে লিখছি। এখন বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত দিগন্ত মেঘলা মেঘলা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তাই মনটা ভাল না। আচ্ছা মা, সারা রাত এমনি চলার পর পূর্বয়াকাশে যে লাল সূর্য উঠে, তার কাঁচা আলো খুব উজ্জ্বল হয় তাই না? এই মুহূর্তে আমার ছোতবেলার কথা মনে পড়ছে। বর্ষা এলে তুমি বাইরে যেতে দিতে না, একদিন তোমার অজান্তে বাইরে আসতেই পিছলে পড়ে পায়ে চোট লাগে, তখন তুমি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলে। ওষুধ দিয়ে ভর্তি হয়েছিল টেবিলটা, আমার বেশ মনে আছে। তখন থেকে একা বাইরে যেতে সাহস পেতাম না। ভয় লাগত, বাইরে গেলেই পড়ে যাব। কিন্তু আজ! আজ আমার অনেক সাহস হয়েছে, রাইফেল ধরতে শিখেছি। বাংকারে রাতের পর রাত কাটাতে হচ্ছে, তবু ভয় পাই না।শত্রুর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমনে শিরায়-উপশিরায় রক্তের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। মা, সত্যি তোমাকে বঝাতে পারবনা। ছোটবেলার কথা মনে পড়লে কেমন যেন লাগে। কিন্তু আমার একি আশ্চর্য পরিবর্তন, কারণ আমি আমার স্বদেশ, আমার বাংলাকে ভালবাসি। মা, কৈশরে একদিন আব্বা আমাকে সৈয়দপুরে নিয়ে গিয়েছিল, স্পেশাল ট্রেন দেখাতে। সেখান থেকে আমি হারিয়ে যাই। তখন একলা একলা অনেক্ষন ঘুরেছিলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ঘনঘটা নেমে এসেছিল, আমার কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। মনে হয়েছিল, আমি হারিয়ে গাছি। তখন মনে হয়েছিল, আর কনো দিনই হয়তো তোমার কাছে ফিরে যেতে পারবনা। তখন কাঁদতে কাদতে স্টেশনের দিকে আস্তে শুরু করেছিলাম। রাস্তায় হাজারী বেলপুকুরের হাই-ই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। দেখি সেখানে কিছুক্ষন পর আব্বা গালেন। পরদিন এসে সমস্ত কথা শুনতে না শুনতে আমাকে বুকে জড়িয়ে তুমি কাঁদছিলে। অথচ সেদিন তুমি তো কাঁদলে না মা! আমি রণাঙ্গনে চলে এলাম। গুলি, শেল, মর্টার নিয়ে আমার জীবন। ইয়াহিয়ার জঘন্যতম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁরাবার জন্য দুর্জয় শপথ নিলাম। এখন বাংকারে বাংকারে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়। কখনো বা রাতের অন্ধকারে শত্রুর ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই।এ যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ, মা, জয় আমাদের হবেই হবে।

মাগো, সেদিনের সন্ধ্যাটাকে আমার বেশ মনে পড়ছে। আজকের মত মেঘলা মেঘলা আকাশ সেদিন ছিল না। সমস্ত আকাশটা তারায় ভর্তি ছিল। তুমি রান্না ঘরে বসে তরকারি কুটছিলে। আমি তোমাকে বললাম, 'মা,আমি চলে যাচ্ছি।' তউমি মুখের দিকে তাকালে। আমি বলেছিলাম, 'মা, আমি মুক্তি বাহিনীতে চলে যাচ্ছি।' উনুনের আলোতে তোমার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তোমার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তুমি দাঁরিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তাকালে। আমার ঘরের পেছনে বেলগাছটার কিছু পাতা বাতাসে দোল খেয়ে আবার স্থির হয়ে গেল। মা, সেদিন সন্ধ্যাতেই তুমি আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছিলে। মা, মনে হচ্ছে কত যুগ পাড়িয়ে গেছে, আর একটি দিন ইতিহাসের পাতার মত রয়ে গেছে। কত আশা, কত আকাঙ্খা অন্যায়ের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু মা দিনান্তের ক্লান্তে নিত্যকার মতো সেই সন্ধ্যাটা আবার আসবে তো?

ইতি
তোমার স্নেহের
ববিন

চিঠি লেখকঃ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ ববিন (সেক্টর ৬, কোম্পানি সি, গ্রুপ এফএফ, বাড়ি নং ৩/৬)।

চিঠি প্রাপকঃ মা মোছা। রফিয়া খাতুন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ তোতন সাহা ও সজু, সাহাপাড়া, ডোমার, নীলফামারী।

২৭ আষাঢ়, ১৩৩৮

আব্বা,
আমার সালাম ও কদমবুসি গ্রহন করুন। জীবনে যত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আমি আজ চলে যাচ্ছি, জানি না আর ফিরে আসব কি না। যদি ফিরে আসতে পারি তাহলে দেখা হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, যেন আপনার ছেলে এ দেশের মুক্তিসংগ্রামে গাজী হতে পারে। আমি জীবনে কোন দিন আপনাদের সুখ দিতে পারি নাই। জননিা দিতে পারব কি না। দোয়া রাখবেন। আপনার থেকে যে টকা নিচ্ছি, মামার কাছ থেকে এনে মহাজনকে দিবেন। আর মামাকে তার চিঠিটা দিবেন। মায়ের প্রতি নজর দিবেন। আমি জানি, আমি চলে যাবার পর মায়ের মাথা আরও খারাপ হবে। কিন্তু এ ছড়া আমার পথ নেই। তার প্রতি নজর রাখবেন। সইয়েদকে হাতে হাতে রাখবেন।বুবুকে আমার সালাম দিবেন।আমি যাচ্ছি কলকাতর পথে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন বরিশাল গেছে।আর আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন সহিসালামতে আবার ফিরে আসতে পারি। কাকুকে আমার সালাম দিবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের টুকরো
হক

চিঠি লেখক: মুক্তিযোদ্ধা হক। পুরো নাম আজিজুল হক।

চিঠি প্রাপক:
বাবা হামিজউদ্দিন, হাওলাদার, গ্রাম: আ-কলম, থানা: স্বরুপকাঠি, জেলা: পিরোজপুর

চিঠিটি পাঠিয়েছেন: মুক্তিযোদ্ধার ছোট ভাই মো: শাহরিয়ার কবীর, সহকারী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টরনেটিভ (ইউডা), রোড-২৫, বাড়ি ৩০১, ধনমন্ডি, ঢাকা।

১৬ই জুলাই ১৯৭১ ইং

মামণি আমার,

তুমি যখন ইনশাল্লাহ পড়তে শিখবে, বসতে শিখবে তখনকার জন্য আজকের এই চিঠি লিখছি। তোমরা (...) নিশ্চয়ই। অনেক অভিমান জমা, আব্বু তোমাকে দেখতে কেন আসে না? মামণি, আব্বু আজ তোমার জন্মদিনে তোমাকে বুকে নিয়ে বুক জুড়াতে পারছি না, এই দুঃখ তোমার আব্বুর জীবনেও যাবে না।। কী অপরাধে তোমার আব্বু আজ তোমার কাছে আসতে পারে না, তোমাকে কোলে নিয়ে আদর করতে পারে না, তা তুমি বড় হয়ে হয়তো বুঝবে, মা। কারণ আজকের অপরাধ তখন অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আজকে এ দেশের জনসাধারণ তোমার আব্বুর মতই অপরাধী, কারণ তারা নিজেদের অধিকার চেয়েছিল। অপরাধী দেশবরেণ্য নেতা, অপরাধী লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক – এ দেশের সব বুদ্ধিজীবী কারণ তারা এ দেশকে ভালোবাসে। হানাদারদের কাছে, শোষকদের কাছে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছুই নেই। এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সেই দণ্ড এড়াবার জন্য লাখ লাখ লোক দেশ ত্যাগ করেছে। সেই দণ্ড এড়াবার জন্য তোমার আব্বুকে গ্রামে – গ্রামে, পাহাড়ে – জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। তাই আজ বুক ফেটে গেলেও আব্বু এসে তোমাকে নিয়ে আদর করতে পারছে না। মনের মণিকোঠায় তোমার সেই ছোট্ট মুখখানি সব সময় ভাসে, কল্পনায় তাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিই। আর তাতেই তোমার আব্বুকে সান্ত্বনা পেতে হয়।

আব্বু, নামাজ পড়ে প্রত্যেক ওয়াক্তে তোমার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ রহমানুর রাহিমের কাছে মোনাজাত করি, তিনি যেন তোমার আম্মুকে আর তোমাকে সুস্থ রাখেন, বিপদমুক্ত রাখেন।

মামণি, তোমার আম্মু লিখেছে, তুমি নাকি এখন কথা বলো। তুমি নাকি বলো, 'আব্বু জয় বাংলা গাইত।' ইনশাল্লাহ সেই দিন আর বেশি দূরে নয় আব্বু আবার তোমাকে জয় বাংলা গেয়ে শোনাবে। যদি আব্বু না থাকি, তোমার আম্মা সেদিন তোমাকে জয় বাংলা গেয়ে শোনাবে। তোমার আম্মু আরো লিখেছে তুমি নাকি তোমাকে পিট্টি লাগালে আম্মুকে বের করে দেবে বলে ভয় দেখাও। তোমার আম্মু না ভীষণ বোকা। খালি তোমার আর আমার জন্য কষ্ট করে। বের করে দিলে দেখো আবার ঠিক ঠিক ফিরে আসবে। আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না। তোমার আম্মু দুঃখ পেলে এখন আর কাউকে বলবে না। একা একা শুধু কাঁদবে।তুমি আদর করে আম্মুকে সান্ত্বনা দিও কেমন? তুমি আমার অনেক অনেক চুমো নিও।

ইতি
আব্বু

চিঠি লেখকঃ আতাউর রহমান খান কায়সার। রাজনীতিবিদ, চট্টগ্রাম।

চিঠি প্রাপকঃ মেয়ে ওয়াসেকা এ খান। ৭ আয়েশা খাতুন লেইন, বংসশাল বাড়ি, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

চিঠি পাঠিয়েছেনঃ ওয়াসেকা এ খান

২০.৭.৭১

অনু,
ভালো আছি। তোমার মনের বাঁধ বেঙে গেলে বলব, লক্ষী আমার, মানিক আমার, চিন্তা করো না। তোমার নয়ন কুশলেই আছে। বিধাতার অপার করুনা। যখন আমায় বেশি করে মনে পরবে তখন এই ভেবেই মনকে বোঝাবে, এই বলেই বিধাতার কাছে পার্থনা জানাবে- শুভ কাজে অনড় থেকে শুভ সমাধা করে যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারি। ফিরতে পারি মায়ের বুকে-মুছিয়ে দিতে মায়ের এত কান্নাকে। নতুন দিনের আলোয় ভরা উজ্জ্বল প্রভাতে গিয়ে যেন মাকে মা বলে ডাকতে পারি। দোয়া করো। তোমরা সবাই নামায পরো। তোমার মনের দৃঢ় প্রত্যয় আমায় জাগাবে এগিয়ে চলার শ্বাশ্বত মনোবল। আমি এ বলে বলীয়ান হয়ে অন্যায়কে পদদলিত করতে জানব, সত্যকে আঁকড়ে ধরতে পারব বেশি করে। এবং এ পারাই আমায় এগিয়ে নিয়ে যাবে শেষ লক্ষ্যস্থলে, যেখানে ভবিষ্যত বংশধরেরা হাসস্তে পারবে-কথা বলতে পারবে-বাঁচার মতো বাঁচতে পারবে নিজ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে।

পাহাড়ের শ্যামল বনরাজির এ মেলায় প্রায় প্রতিদিন বর্ষা নামে চারদিক অন্ধকার করে। বর্ষার অশান্ত বর্ষণে পাহাড়ি ঝড়নায় তখন মাতন নেমে আসে। দুর্বার বেগে ঝরনার সে জলধারা কলকল গান করে এগিয়ে চলে সমতলের দিকে। আমার মনের সবটুকু মাধুরী ঢেলে তখন সে ধারাকে কানে কানে বলি-ওগো ঝরনার ধারা, তুমি সমতলের দেশে গিয়ে আমার অনুকে আমার এ বারতা বলে দিয়ো, 'ওকে আমার একান্ত কাছে পাই যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। নিকষ কালো অন্ধকারের একাকিত্ব তখন আর থাকে না। মনের আলোয় আমি সবকিছু দেখতে পাই। দূরকে দূর মনে হয় না। একাকার হয়ে যায়। ওগো ঝরনার ধারা, তুমি অনুকে এও বলো-তোমার নয়ন তোমার কথা ভাবে-মনের প্রশান্তিতে ভরিয়ে আনতে তাকে সাহায্য করে সবদিক দিয়ে' তুমি ওকে বলো-মিছে মিছে আমার অনু যেন মন খারাপ করে না থাকে। ওর হাসিখুশি মন ও আত্নশক্তিই তো আমার প্রেরণার উৎস।

আচ্ছা, সত্যি করে বল তো লক্ষী, তুমি কি গোমরা মুখ করে সারা দিন ঘরের কোণে একাকী বসে বসে কাটাও? না, এ চিঠি পাবার পর থেকে তা করো না। আমি কিন্তু টের পেয়ে যাব। তিন সত্যি করে বলছি- দেশে গিয়ে তোমার সেই কিচ্ছাটা সুন্দর করে শোনাব। না, না, মিথ্যে বলছি না। অবশ্য আগে বলতাম। বিশ্বাস করো আগের আমি আর এখনকার আমি অনেক তফাৎ। এখনকার আমি ভবিষৎ বংশধরের প্রাথমিক সোপান।

তোমার শরীরে পরিবর্তন এসেছে অনেকটা বোধহয়। নিজের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ো। মনকে প্রফুল্ল রেখো। মনের প্রফুল্লতা ভবিষ্যৎকে সুন্দর করবে।প্রয়োজনবোধে ঔষধ সেবন করো। সাবধানে থেকো। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। আম্মাকেও কোথাও যেতে দিয়ো না। বুঝি, আমার কথা তুমি একটু বেশি করেই ভাব। সত্যি বলছি, ভাববার কিছুই নেই। আজ আমি ধন্য এই জন্য যে আমি আমার দেশকে ভালবাসতে শিখেছি। আমার এ শিক্ষা কোনো দিন বিফলে যবে না। তোমার সন্তানেরা একদিন বুক উঁচু করে তাদের বাবার নাম উচ্চারণ করতে পারবে। তুমি হবে এমন সন্তানের জননী, যে সন্তান মানুষ হবে, মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে জানবে। এবং এ মানুষ হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তোমার উপর। কেবল মাত্র আত্নশক্তিতে বলীয়ান মা--ই তেমন সন্তান দেশকে দিতে পারে। আশাকরি তুমি সেই আদর্শ জননীর ভূমিকাই পালন করে যাবে-কাজে, কথায়, চিন্তায়।

মার সাথে দেখা করে আসতে পারিনি। পারিনি আজ পর্যন্ত সন্তানের কর্তব্য পালন করতে। আমার অবর্তমানে তাঁকে দেখার ভার তোমার ওপর রইল। সন্তান হয়ে যা করতে পারিনি, বধূ হয়ে তোমায় তা

করতে হবে।

পরিশেষে বলব, যত্রা সবে শুরু হলো। পথ এখনো অনেক বাকি। পথের দুর্গমতা দেখে থমকে দাঁড়ালে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে দৃঢ় পদক্ষেপে, সকল বাধা কে দলিতমথিত করে। এর জন্য চাই অটুট মনোবল। সে মনোবলের অধিকারিণী হয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করে গড়ে তোলো।

গকুল নগর থাকতে কি মজার ব্যাপার হয়েছিল তা অনেকদিন পর হলেও লিখে আজকের লেখার ইতি টানব। কী কারণে যেন সেদিন সারা বেলা উপোস থাকতে হয়েছিল। খওয়া আর হয়ে উঠেনি। সকালবেলাতেও না-রাতেও না। একেবারে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েও কিন্তু ঘুমিয়ে থাকতে পারিনি।

তুমি এসে ঘুমের বারটা বাজিয়ে হরেক রকমের এত খানা খইয়ে দিয়েছ যে আর খেতে পারি না বলে তোমার হাত চেপে ধরে যই দুষ্টুমী করতে গিয়েছি, অমনি ঘুম ভেঙে গেল। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে দেখি আমি বাড়িতে শুয়ে নেই। সুউচ্চ পাহাড়ের মালভূমিতে তাঁবুর এক কোণ ঘেঁষে আমার ব্যাগটার (যেটা বালিশের কাজ দিচ্ছিল) হ্যান্ডেল ধরে ওপরের দিকে চেয়ে আছি।তাঁবুর সামনের পর্দা সরিয়ে দেখি ভোর হতে আর দেরি নেই।... সেই যে একদিন এলে- এরপর আর আসনি। এলেই তো পারো! এবার কিন্তু ইতি টানব না-শুধু বলব-নিচে একটা ধাঁধা দিলাম, মাথ ঘামিয়ে ভেঙে দাও। ভঙতে পারলে জানতে পারবে আমি কোথয় আছি।

ধাঁধা
তিন অক্ষরের নাম আমার হই দেশের নাম
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে গছেতে চড়লাম
শেষের অক্ষর বাদ দিলে কাছে যতে কয়
বলো তো অনু, আমি রয়েছি কোথায়?

আব্বা আম্মাকে সালাম দিয়ো দোয়া করতে বলো। চোটদের স্নেহাশিস জানিয়ো। তুমি নিও সহস্র চুমো-অনেক আদর।

তোমার নয়ন

চিঠি লেখক: মুক্তিয়োদ্ধা পাটোয়ারি নেসারউদ্দিন (নয়ন)

চিঠি প্রাপক: স্ত্রী ফাতেমা বেগম (অনু), গ্রাম: মৈশাদী, ইউনিয়ন: তরপুরচণ্ডী, থানা ও জেলা: চাঁদপুর বর্তমান ঠিকানা: চ ২৭/৭ স্কুল রোড, চতুর্থ তলা, ওয়্যারলেস গেট, মহাখালী, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন: ফাতেমা বেগম (অনু)

২১ জুলাই ১৯৭১

মা,

সর্বপ্রথম আমার সালাম ও কদমবুসি গ্রহন করবেন। পর সনাচার এই যে আমি আজ এমন এক স্থানে রওয়ানা হলাম, যেখানে মিলিটারির কোন হামলা নেই। তাই আজ আপনার কাছে লিখতে বাধ্য হলাম। আমার সমস্ত দোষ। তাই আপনি আমার অন্যায় বলতে যাকিছু আছে, সমস্ত ক্ষমা করে দিবেন।আমার প্রতি কোন দাবী রাখবেন না। কারণ আমার মৃত্যু যদি এসে থাকে, তবে আপনার আমাকে বেঁধে রাখতে পারবেন না। মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। মৃত্যুর জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত। গ্রামে বাসে শিয়াল-কুকুরের মত মরার চেয়ে যোদ্ধাবেশে আমি মরতে চাই। মরণ একদিন আছে। আজ যদি আমার মরণ আসে, তাহলে আমাকে আপনারা মরণ থেকে ফিরাতে পারবেন না। মরণকে বরণ করে আমার যত্রা শুরু করলাম। আমার জন্য দুঃখ করবেন না। মনে করবেন আমি মরে গেছি। দোয়া করবেন, আমি যতে আমার গন্তব্য স্থনে ভালোভবে পৌছাতে পারি। আব্বাকে আমার জন্য দোয়া করতে বলবেন। সে যেন আমার সমস্ত অন্যায়কে ক্ষমা করে দেয়। নামাজ পড়ে আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনার ছেলে যদি হয়ে থাকি, তবে আমার জন্য দুঃখ করবেন না। বাড়ির সবার কাছ থেকে আমার দবি ছাড়বেন। খোদায় যদি বাচাঁয়, তব আমি কয়েক দিনের ভেতর ফিরে আসব। ইনশাল্লাহ খোদা আমাদের সহায় আছেন। মিয়াভাইয়ের কাছে আমার সালাম ও দোয়া করতে বলবেন। আর আমার জন্য কোন খোঁজ বা কারও ওপর দোষারোপ করবেন না।এটা আমার নিজের ইচ্ছায় গেলাম। আমি টাকা কোথায় পেলাম সে কথা জানতে চাইলে আমি বলব, বাবুলের মায়ের ট্রাংক থেকে আমি ৬০ টাকা নিলাম এবং তার টাকা আমি বাঁচলে কয়েক দিনের ভেতর দিয়ে দেব। বাবুলের মায়ের টাকার কথা কারও কাছে বলবেন না। আর বাবুলের মাকে বলবেন, সে যেন কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে। জানি, আমাকে দিয়ে আপনাদের সমস্ত আশা ভরসা করছেন। কিন্তু আমার ছোট ভাই দুইটাকে দিয়ে সে সমস্ত আশা সফল করতে চেষ্টা করবেন। দাদা ও মুনিরকে মানুষ করে ওদের দ্ধার আনার সমস্ত আশা বাস্তব রুপে ধারণ করবেন। আমার এ যাত্রা মহান যাত্রা। আমরা ভালোর জন্য এরুপ যাত্রা করলাম।অতি দুঃখের পর এ দেশ থেকে চলে গেলাম। দোয়া করবেন।

খোদা হাফেজ।

ইতি

আপনার হতভাগা ছেলে

আমি

চিঠি লেখকঃ মুক্তিযোদ্ধা দুদু মিয়।

চিঠি প্রাপকঃ মা আনোয়ারা বেগম।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ আবুবকর সিদ্দিক, পিতা মৃতঃ আবুল হোসেন তালুকদার, গ্রামঃ নরসিংহলপট্টি,

ডাকঘরঃ শাওড়া, উপজেলাঃ গৌরনদী, জেলাঃ বরিশাল।

২৩/৭/১৯৭১, শুক্রবার

১.

মা ও আব্বাজান,

আমার সালাম ও কদমবুসি জানিবেন। আজ কয়েকদিন গত হয় আপনাদের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছি। খোদার কৃপায় মঙ্গলেই পৌছিয়াছি। হযরতের কাছ হইতে হয়তো এ কয়দিনে একখানা পত্র পাইয়াছেন।তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন আমি কোথায় আছি। আমি ভাল আছি। আমার জন্য সবাইকে ও আপনারা দোয়া করিবেন। শ্রেণীগতভাবে সবাইকে আমার সালাম ও স্নেহাশিস দিবেন। নানা অসুবিধার জন্য খোলাখুলি সবকিছু লিখিতে পারিলাম না।

ইতিঃ হাকিম

N.B. হয়তো মাস দুই পরে বাড়ি ফিরিব। আবার তা নাও হইতে পারে।

২.

শ্রদ্ধেয় মামাজান,

আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম ও কদমবুসি গ্রহন করিবেন। আশাকরি ভলো আছেন। আমরা আপনাদের দোয়ায় ভালোই ভালোই আছি। আমার জন্য কোনরূপ চিন্তা করিবেন না। দোয়া করিবেন যেন ভলোভাবে আপনাদের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারি ও উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারি। অধিক কি আর লিখিব। আমাদের বাড়িতে সংবাদ দিবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের মতি

একই কাগজে পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা চিঠি লিখেছেন। তাঁদের মাধ্যে মুক্তিযোদ্ধা মতি শহীদ হন। তাঁরা চিঠিগুলো লিখেছেন পশ্চিম বঙ্গের করিমগন্জ স্টশনের নিকটবর্তী কচুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের ট্রনজিট সেন্টারে অবস্থান কালে। পত্র লেখকদের নামঃ হাকিম, হাশমত, হাসু, মতি ও মোতালেব। বইটিতে হাকিম ও মতির চিঠি প্রকাশিত হয়েছে।

চিঠি প্রাপকঃ মোঃ শামসুল আলম, প্রযত্নেঃ মৌলভী সেহাবউদ্দিন, গ্রামঃ নলসন্দা, পোঃ ডিগ্রীর চর, উল্লাপাড়া, পবনা (বর্তমানে সিরাজগন্জ জেলা)

চিঠি পাঠিয়েছেন: মোঃ শামসুল আলম। তিনি বর্তমানে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের দিনাজপুর

দক্ষিনের উপমহাব্যবস্থাপক।

ঝালকাঠি, মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট
২৪/৭/৭১, বাংলা ৬ শ্রাবণ, ১৩৭৮

স্নেহের ফিরোজা,
তোমাকে ১৭ বত্সর পূর্বে সহধর্মিণী গ্রহণ করিয়াছিলাম। অদ্যাবধি তুমি আমার উপযুক্ত স্ত্রী হিসাবে সংসারধর্ম পালন করিয়া আসিয়াছ। কোন দিন তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আজ আমি (...) তোমাদের অকুল সাগরে ভাসাইয়া পরপারে চলিয়াছি । বীরের মত সালাম - ইনশাল্লাহ জয় আমাদের হইবে, দুনিয়া হইতে লাখ লাখ লোক চলিয়া গেছে খোদার কাছে । কামনা করি যেন সব শহীদের কাতারে শামিল হইতে পারি । মনে আমার কোন দু:খ নাই। তবে বুক জোড়া কেবল আমার বাদল। ওকে মানুষ করিয়ো। আজ যে অপরাধে আমার মৃত্যু হইতেছে খোদাকে স্বাক্ষী রাখিয়া আমি বলিতে যে এই সব অপরাধ হইতে আমি নিস্পাপ। জানি না খোদায় কেন যে আমাকে এই রূপ করিল।
জীবনের অর্ধেক বয়স চলিয়া গিয়াছে, বাকি জীবনটা বাদল ও হাকিমকে নিয়া কাটাইবে । (...) পারিলাম না । (...) বজলু ভাইয়ের বেটা ওহাবের
কাছে ১৫ হাজার টাকা আছে । যদি প্রয়োজন মনে কর তবে সেখান হইতে নিয়া নিয়ো।

ইতি
তোমারই
বাদশা
(বাবা হাকিম, তোমার মাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইয়ো না)

চিঠি লেখকঃ শহীদ বাদশা মিয়া তালুকদার, গ্রামঃ বাঁশবাড়িয়া, উপজেলাঃ টুঙ্গিপাড়া, জেলা গোপালগঞ্জ।

চিঠি প্রাপকঃ স্ত্রী ফিরোজা বেগম।

চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ মোঃ বাদল তালুকদার। ১/২ ব্লক জি, লালমাটিয়া, ঢাকা।

২৯.৭.৭১
বয়ড়া

নীলু,
নসিরের হাতে পাঠানো চিঠি কাল পেয়েছি ও আজ পোষ্টের চিঠিটা পেলাম। খোকন যবার সময় মনসুর থাকাতে তবুও সময় চলে গেছে। সেদিন ও চলে যবার পর এখন একদম Lonely লাগছে, তবে গত ৩-৪ দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। তই সময় কেটে গেছে। গতকল ভোর রাত্রে ছোটিপুর (...) আক্রমণ করেছিলাম ও দরুন যুদ্ধ হয়েছে। গুলি ফুরিয়ে যওয়াতে আমরা পিছে চলে আসতে বাধ্য হই। আমরা মাত্র ৪০ জন আর ওরা ১৫০ এর মত ছিল। কিন্তু আক্রমণে টিকতে না পেরে বহু পালিয়ে যায়। আমরা শেষ পর্যন্ত ওদের শেষ Defence-এর দের শ গজের মধ্যে চলে যেতে পেরেছিলাম। আমরা আর আধা ঘন্টা টিকতে পারলে দখল করতে পারতাম। কারণ আজ জানলাম ওরা নৌকা তিনটা করে পালিয়ে যেতে জোগাড় করেছিল। ভোর ৪-২০ থেকে ৭-৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ওদের বার জন মারা গেছে ও বহু আহত হয়েছে। আমাদের তরফে একজনের হাতে গুলি লাগে–হাসপাতালে আছে। Col কাপুর General–কে আমার এই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা দারুন ফুলে যওয়ার মত Report দিয়েছে।

খোকনকে বলো ইনশাল্লাহ আগামীকাল রাত্রে আমর সেই Operation টা করব, যেটা সেদিন রওয়ানা হবার সময় Cancel করি।

আজ Radio–তে (Daily) Telegraph-এ Peter Bill-এর আমার ও আমার মুক্ত এলাকার Report শুনে খুব খুশি লেগেছে। আজ বাংলাদেশ মিশন থেকে আমাকে জানিয়েছে যে Peter Bill নাকি এই প্রথমবার আমাদের সম্বন্ধে একটা Favorable report দিল। আরও শুনলাম Time–এ বেরিয়েছে। এসবের Copy–গুলো জোগাড় করো। মওদুদকে বলো, Daily Mirror-এ কিছুদিন আগে আমার এলাকা সম্বন্ধে যে Report বেরিয়েছিল, সেটা যেন অবশ্যই দেয় ও অন্য যাদের নিয়েছিল সেগুলোও দেয়।

তুমি শুনলে খুশি হবে যে সেদিন জিওসির Conference-এ জানলাম যে আমার Coy (Company) শত্রু ধ্বংস করার Record-এ সমস্ত পশ্চিম রণাঙ্গণে প্রথম স্থানে ও আমার Coy-কে Best বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল Indian film division আমার এলাকার Movie তুলতে আসবে।

এত সব হওয়া সত্বেও ভীষণ একা লাগছে এবং কেমন যেন অসহ্য লগছে। Physically ও Mentally completely tired সবসময়। সবকিছু ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছা করে, কিন্ত তখনই বিবেকের কাছে ভীষন অপরাধী মনে হয়। আজ তো প্রায় French leave-এ চলে আসছিলাম। সকালে গিয়ে বিকেলে চলে আসা, কিন্তু পরে আবার বিবেকের তাড়নায় ইচ্ছা ছাড়লাম।
... ...

ইত্তু ও নাহীন মনিরা কেমন আছে? ওদের আমার অনেক আদর দিয়ো। বরিশালের আর নতুন কোনো খবর পেলে কি না জানাবে। লোক পেলে আমি লিখব।
আশাকরি তোমরা সবাই ভাল আছ। আব্বা-আম্মা ও আপাকে আমার সালাম দিয়ো। খোকন ও খুশনুদকে ভালবাসা দিয়ো।
জলদি দিয়ো।
ইতি
গুড়ু

চিঠি লেখকঃ মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা। সাব সেক্টর কমান্ডার। লিখেছেন বয়ড়া থেকে। তিনি ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর নিহত হন।
চিঠি প্রাপকঃ স্ত্রী নীলুফার দিল আফরোজ বানু। ১৯৭১ সালে তিনি কলকাতায় ছিলেন। তাঁর বর্তমান ঠিকানাঃ ১৫৯ ইস্টার্ন রোড, লেন ৩, নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।
চিঠিটি পাঠিয়েছেনঃ নীলুফার দিল আফরোজ বানু।

টেকের হাট থেকে, ৩০.৭.৭১

প্রিয় আব্বাজান,
আমার সালাম নিবেন। আশাকরি খোদার কৃপায় ভালোই আছেন। বাড়ির সকলের কাছে আমার শ্রেণীমত

সালাম ও স্নেহ রইল। বর্তমানে যুদ্ধে আছি আলী রাজা, রওশন, সাত্তার, রেণু, ইব্রাহিম, ফুল মিয়া। সকলেই একত্রে আছি। দেশের জন্য আমরা সকলেই জান কোরবান করেছি। আমাদের জন্য ও দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। আমি জীবনকে তুচ্ছ মনে করি। কারণ দেশ স্বাধীন না হলে জীবনের কোন মূল্য থাকবে না। তাই যুদ্ধকেই জীবনের পাথেয় হিসোবে নিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে মাকে কষ্টজ দিলে আমি আপনাদেরকে ক্ষমা করব না। পাগলের সব জ্বালা সহ্য করতে হবে। চাচা মামাদের ও বড় ভইদের নিকট আমার সালাম। বড় ভাইকে চাকুরীতে যোগ দিতে নিষেধ করবেন। জীবনের চেয়ে চকুরী বড় নয়। দদুকে দোয়া করতে বলবেন। মৃত্যুর মুখে আছি। যকোন সময় মৃত্যু হতে পারে এবং মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত। দোয়া করবেন মৃত্যু হলেও যেন দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেখবেন লাখ লাখ ছেলে বাংলার বুকে পুত্রহারাকে বাবা বলে ডাকবে। এই ডাকের অপেক্ষায় থাকুন।

আর আমার জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনার দুই মেয়েকে পুরুষের মতো শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। তবেই আপনার সকল সাধ মিটে যাবে। দেশবাসী, স্বধীন বাংলা কায়েমের জন্য দোয়া করো, মীরজাফরী করো না। কারণ মুক্তিফৌজ তোমাদের ক্ষমা করবে না এবং বাংলায় তোমাদের জায়গা দেবে না।

সালাম, দেশবাসী সালাম।

ইতি

মো. সিরাজুল ইসলাম

১৯৭১ সালের ৮ আগস্ট ৫ নম্বর সেক্টরের বড়ছড়া সাবসেক্টরের সাচনা জামালগঞ্জে পাক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তি বাহিনীর ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। বীর যোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম একটি মাত্র প্লাটুন নিয়ে পাকবাহিনীর সুরক্ষিত ঘাটি সাচনা আক্রমণ করেন। সুগঠিত পাকবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের মুখে মুক্তিযোদ্ধাদের টিকে থাকাই ছিল অস্ভব। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছিল সীমিত অস্ত্র। এমন পরিস্থিতিতে সাহসী কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম সহযোদ্ধাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজে গ্রেনেড নিয়ে ক্রলিং করে শত্রুর বাংকারের দিকে এগিয়ে যান। শত্রুর দুটি বাংকারে গ্রেনেড চার্জ করে তছনছ করে দেন। তৃতীয় বাংকারে গ্রেনেড চার্জ করার আগমুহূর্তে শত্রুপক্ষের এলএমজি বুলেট বিদীর্ণ করে দেয় তার দেহ। তিনি শহীদ হওয়ার কিছুদিন আগে ৩০ জুলাই টেকেরহাট থেকে বাবাকে পত্রটি দিয়েছিলেন।

সংগ্রহঃ মেজর (অব.) কামরুল ইসলাম ভুইঁয়া ও ড। সুকুমার বিশ্বাসের কাছ থেকে।

এখানে প্রকাশিত চিঠিগুলো গ্রামীণফোন এবং প্রথম আলো কর্তৃক সংগৃহীত এবং "একাত্তরের চিঠি" পুস্তক নামে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির মূলসত্ত্ব প্রকাশক এবং লেখকের। গবেষণা এবং রেফারেন্সের জন্য এই পুস্তকের ইউনিকোড বাংলায় রূপান্তরিত পিডিএফ পুস্তকটি বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য। কোনপ্রকার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এর পূনর্মুদ্রন এবং বিতরণ নিষিদ্ধ ।